IJCRT.ORG ISSN : 2320-2882

INTERNATIONAL JOURNAL OF CREATIVE RESEARCH THOUGHTS (IJCRT)

An International Open Access, Peer-reviewed, Refereed Journal

Middle-Class Struggles Amid of The Refugee Crisis: A Study Of Santosh Kumar Ghosh's 'Dwiji'

উদ্বাস্তু সংকটের প্রেক্ষিতে মধ্যবিত্ত জীবনের টানাপোড়েন : সন্তোষকুমার ঘোষের 'দ্বিজ'

Sarala Mandi

Assistant Professor, Department of Bengali, Netaji Mahavidyalaya, Arambagh, Hooghly, West Bengal, India, Pin-712601

Abstract: Santosh Kumar Ghosh occupies a distinctive place in modern Bengali fiction. Among the writers who engaged with the theme of Partition, Ghosh emerges as a novelist of a different sensibility and perspective, reflecting the moral and psychological crisis of the time in a unique narrative voice. In his stories reflect the refugee crisis caused by the Partition, communal harmony that followed, the pain of displacement, the recollection of past memories, and the struggle for identity in the post-Partition period. His stories vividly portray the harsh realities of those who, not only in East or West Bengal but even beyond the borders of India, suffered and led helpless lives as victims of the Partition. In this paper, I have discussed Santosh Kumar Ghosh's short story 'Dwij' in the context of the refugee crisis, exploring the conflicts and complexities of middle-class existence in post-Partition Bengal. In the story 'Dwij' the writer shows that after the Partition, the Bengali middleclass people fell in to a deep crisis. On one hand, they are educated, cultured and religious; on the other hand, they are victims of fear, insecurity, and self-centeredness in real life. They speak of humanity, yet lose their sense of humaneness. Pride in religion and community makes them believe in their own superiority. In this story, the author shows that people can rise above the divisions and hatred of Partition and return to the light humanity – becoming the true 'Dwij', the reborn human beings. For the author partition is not only social reality but also a moral test in which the middleclass society fails the trial of humanity. Therefore, this story is not merely about the life of refugees; it is a profound moral protest against the downfall of humanity.

Keywords: Partition, Middle-Class Struggles, Refugee Crisis, Illegal entry, Communal riot, Laking Humanity

মূল আলোচনা : বিশ্বযুদ্ধোত্তর সময়ে ভারত ভাগ উপমহাদেশের ট্র্যাজেডি হয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে। একটি দেশভাগ হয়ে যাওয়া মানে যে শুধু রাজনৈতিক ও ভৌগলিক ভাবে ভাগ হয়ে যাওয়া নয়, ভাগ হয়ে যায় সমাজ, সংস্কার, সংস্কৃতি ও মানুষের বিবেক। স্বাধীনতা অর্জন করার ফলে একদিকে যেমন দেখা যায় আনন্দ তেমনই অন্যদিকে দেখা যায় দেশভাগের করুণ বেদনার চিত্র। এই দেশভাগ যাদের উপর প্রত্যক্ষভাবে হানা দিয়েছিল, সেইসব আশ্রয়হীন মানুষের কি প্রতিক্রিয়া হয়েছিল, তারা কিভাবে দেখেছিল এই স্বধীনতাকে। তাদের সেই সংকট, সংস্কার ও অন্য জায়গায় উদ্বাস্তু হয়ে থাকার ফলে মানিয়ে গুছিয়ে জীবনধারণের জন্য আপামর যে সংগ্রাম করছে আমরা সন্তোষকুমার ঘোষের 'দ্বিজ' গল্পের মধ্যে তা দেখতে পাই। এই উদ্বাস্ত মানুষগুলো তাদের আশ্রয় ত্যাগ করলেও তারা কিন্তু তাদের যা কিছু অন্তরজাত তা কিন্তু এক নিমিষে ত্যাগ করতে পারেনি। মানুষের যা কিছু অন্তরজাত, প্রজন্মের পর প্রজন্ম ধরে বংশ পরম্পরায় চর্চিত হয়ে আসছে তা কি সত্যিই ত্যাগ করা সম্ভব? মায়ের ভাষা, মাটির ভাষা ত্যাগ করা যায় না, ত্যাগ করা যায় না জীবনচর্চায় ও জীবনচর্যায় বহমান জীবনরীতি। উদ্বাস্তুরা কেবল নতুন জায়গায় এসে তাদের যা কিছু বাহ্যিক তার পরিবর্তন করার চেষ্টা করলেও তাদের

আভ্যন্তরিক যা কিছু সেটো তারা বদলে ফেলতে পারে না। তাদের পূর্বতন ভাষারীতি নতুন ভূভাগে এসে বেমানান হয়ে যায়, অনেকে সময় তা হাস্যরসের সৃষ্টি করে। তাদেরকে নতুন খোলসের অনুসারী করে তোলার জন্য প্রতিমুহূর্তে জীবনযুদ্ধ চলতে থাকে। চরিবহমানতায় ভেসে চলার নামই জীবন। এই জীবনকে তো অস্বীকার করা যায় না। ভিটেহারা মানুষগুলো শুধু যে খাদ্য, বস্ত্র, বাসস্থানের লড়াইয়ে সমবেতে হয়েছে তা নয়। তাদের এই লড়াই ছিল সন্মানের, আত্মমর্যাদার ও আত্মপ্রতিষ্ঠার। দেশেভাগ অতিসাধারণ মানুষের বুকের উপর দিয়ে কাঁটাতারের বেড়োর সীমারেখা গেঁথে দিয়েছিল। এই কাঁটাতারের বেড়ো স্বজন হারানোর বেদনার চেয়ে কম নয়। তাদের সবকিছু অন্যত্র ছেড়ে চলে আসতে বাধ্য করা হয়। নিজের ভিটেমাটি ছেড়ে চলে আসার বেদনাময় কাহিনী, তেমনেই বেদনাকাতর নতুন জায়গায় আশ্রয় নেবার মরণাপন্ন কাহিনী, গল্পকার সন্তোষকুমার ঘোষ তাঁর 'দ্বিজ' গল্পের মধ্যে তুলে ধরেছেন।

গল্পকার সন্তোষকুমার ঘোষ বাংলাদেশের ফরিদপুর জেলার রাজবাড়িতে জন্মগ্রহণ করেন ১৯২০ খ্রিস্টাব্দের ৯ই সেপ্টেম্বের। তাঁর পিতা ছিলেন সুরেশচন্দ্র ঘোষ ও মাতা সুরজবালা দেবী। তিনি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে অর্থনীতিতে স্নাতক ডিগ্রি লাভ করেন ১৯৪০ খ্রিস্টাব্দে। সাংবাদিকতাকে জীবিকা হিসেবে গ্রহণ করেছিলেন। ১৯৪২ খ্রিস্টাব্দে 'যুগান্তর পত্রিকার' এডিটর হিসেবে সাংবাদিক জীবনের সুচনা করেন এবং ১৯৫৮ খ্রিস্টাব্দে আনন্দবাজার পত্রিকার বার্তা সম্পাদক হিসেবে যোগদান করেন। এই পত্রিকায় যুক্ত হয়ে বাংলা ভাষার সংবাদ পরিবেশনে নতুনত্ব নিয়ে আনে। এর মাধমে যুক্ত হয়ে নিম্নমধ্যবিত্ত ও মধ্যবিত্ত মানুষের নানা ধরনের সমস্যার কথা তিনি তুলে ধরেন। সাংবাদিকতার পাশাপাশি তিনি সাহিত্যের দিকেও তিনি আলোকপাত করেন। তাঁর লেখনীর মধ্যে সমকালীন সময়কে অত্যন্ত বাস্তবতার সাথে পাঠকের সামনে তুলে ধরেছেন। তিনি তাঁর ছোটগল্পের মধ্যে সমকালীন সময়, সমাজ সমস্যা, মানুষের জীবনের সংকট, দেশেভাগ ইত্যাদি তুলে ধরেছেন। দেশে স্বাধীন প্রাককালীন অবস্থা, দেশবিভাজন, দেশবিভাজনের ফলে মানুষের আশ্রয়হীন হয়ে যাওয়া এবং নতুন জায়গায় উদ্বাস্ত হয়ে পরিচয় বিভিন্ন সংকটকালীন পরিস্থিতি সবকিছুই তিনি তার লেখনীর মধ্যে তুলে ধরেছেন।

'□□□□□□' গল্পটির প্রেক্ষাপটে আলোচিত হয়েছে বিভক্ত বাংলার সংকটকালীন পরিস্থিতি নিয়ে। যারা পূর্ববঙ্গ থেকে বিতাড়িত হয়ে পরিবার পরিজন নিয়ে পশ্চিমবঙ্গে এসেছিল তারা চরম সংকটের মধ্যে পড়েছিল। এই সংকটের মধ্যে বহু পরিবারকে পড়তে হয়েছিল। তারা সবাই একই জায়গায় সামিল হয়েছিল। বেশিরভাগ উদ্বাস্তুদের স্থান হয়েছিল ষ্টেশনের প্লাটফর্মে, বিভিন্ন ক্যাম্পে – যা তাদের আশ্রয়ের ঠিকানা হয়ে গিয়েছিল। এই 'দ্বিজ; গল্পটি সেইরকমই একটি গল্প। গল্পের কেন্দ্রীয় চরিত্র নিশিকান্তবাবু। এই গল্পটি নিশিকান্তবাবু ও তাঁর পরিবারকে কেন্দ্র করে আলোচিত হয়েছে। তারাও এই চরম সংকটের মধ্যে পড়েছিল। গল্পটির মধ্যে আমরা দেখতে পাবো মধ্যবিত্ত জীবনের নানান সমস্যা ও উদ্বাস্তু হয়ে যাওয়ার পর মানুষের জীবনে যে সংকট নেমে আসে তারই চিত্র আবর্তিত হয়েছে গল্পে।

'দ্বিজ' শব্দের আক্ষরিক অর্থ ব্রাহ্মণ। গল্পে নিশিকান্তবাবু হলেন পূর্ববঙ্গীয় ব্রাহ্মণ। দেশেভাগের পর নিশিকান্তবাবু ও তাঁর পরিবার পূর্ববঙ্গের ভিটেমাটি ছেড়ে পশ্চিমবঙ্গে এসেছে। তারা সবাই মহিমপুর ক্যাম্পে আশ্রয় নিয়েছে, সেখানে আরও বেশকিছু পূর্ববঙ্গ থেকে উদ্বাস্তু হয়ে আসা পরিবার আশ্রয় নিয়েছে। সেখানে তারা দারিদ্র, অনাহার ও আশ্রয়হীনতার পাশাপাশি তাদের আরও বড় হয়ে উঠেছে জীবিকা নির্বাহের সমস্যা। এই ছিন্নমূল উদ্বাস্ত মানুষগুলোর জীবন জীবিকার সন্ধানে দিশেহারা। দীর্ঘকাল ধরে তাদের মধ্যে যে সংস্কার বর্নশ্রেষ্ঠতা ছিল তা বাস্তবে নিচে নেমে গেছে। গল্পে আমরা দেখি নিশিকান্তবাবু একজন ব্রাহ্মণ সন্তান। সুতরাং পেশাগতভাবে তাঁর জীবিকা পৌরহিত্য কর্ম করা। এই কাজ সে দীর্ঘকাল ধরে বংশ পরম্পরায় করে আসছে। তাদের জীবন খুব সুন্দরভাবে অতিবাহিত হচ্ছিল-

> "উর্দ্ধতন পঞ্চমপুরুষ ছিলেন স্মৃতিব্যাকরণতীর্থ, দেশবিশ্রুত পণ্ডিত। তাঁর সন্তান, কিন্তু গ্রহবৈগুন্যে লেখাপড়া শেখা হয়নি। গত চারপুরুষ ধরে যজমানী ব্যবসাই চলছে। ...সারাবছর চালডাল কেনার ভাবনা ছিল, বরং বাড়তি কয়েকমণ বিক্রিই করত। আর লালপেড়ে সেই ধুতিগুলো-অতবড় যে বস্ত্র সংকট গেল লড়াইয়ের শেষে বছরে, কোনদিন কাপড়ের অভাব হয়নি।"[১]

অবিভক্ত দেশে কৌলীন্যপ্রথা, পৌরহিত্য, বর্নশ্রেষ্ঠত্ব সব মিলিয়ে জীবন অতিবাহিত হচ্ছে, আর তখনই দেখা যায় দেশবিভাগ, এই দেশবিভাগই তাদের জীবনে কালো ছায়া নিয়ে এলো। এরপর প্রত্যেকে জীবন জীবিকার সন্ধানে বেরিয়ে পড়ল। একে একে সবাই দেশছাড়া হয়ে গেল। সেই রকমেই একটি পরিবার হল নিশিকান্তবাবুর পরিবার। এই নিশিকান্তবাবুর পরিবার জীবিকার সন্ধানে পশ্চিমবঙ্গে চলে আসে। নিশিকান্তবাবু পূর্বপুরুষদের কাজ ধরে রাখার চেষ্টা করলেও তা শেষপর্যন্ত ধরে রাখতে পারেনি। আর্থিক সংকট, সমাজ সংকট সবমিলিয়ে এক চরম সংকটাপন্ন পরিস্থিতিতে নিশিকান্তবাবু জীবিকার্জনের জন্য অন্য পথ অবলম্বন করতে বাধ্য হয়েছে। সে ব্রাক্ষণ সন্তান হয়েও জীবিকা অর্জনের জন্য বিড়ি বাঁধার কাজ করতে বাধ্য হয়েছে। অর্থ উপার্জনের জন্য সে বিভিন্ন জায়গায় ঘুরেছে শেষে সে 'সুশীতল বিড়ি ফ্যাক্টরিতে' কাজ পায় নিশিকান্তবাবু, সেখানে কাজ করে সে সামান্য অর্থ উপার্জন করে, কিন্তু ব্রাক্ষণ সন্তান নিশিকান্তবাবুর মনের মধ্যে চলতে থাকে এক দ্বিধাদ্বন্দ্ব। এই দ্বন্দ্ব তার মনের মধ্যে এক বেদনার্ত সৃষ্টি করে। দেখা যায় একদিকে বেঁচে থাকার জন্য এই পেশা গ্রহণ করতে বাধ্য হয়েছে অন্যদিকে জীবিকার কারণে অন্তরদহন হচ্ছে। এই অন্তরদহনের জন্য দায়ী হচ্ছে দীর্ঘকালীন সংস্কার ও কৌলীন্য। ব্রাক্ষণ সন্তান হয়েও এই বিড়ি বাঁধার কাজ করার জন্য সে নিজের প্রতি হতাশা, ধিক্কার প্রকাশ করেছে। তার এই সংস্কার একদিনের নয়, দীর্ঘকাল ধরে লালিত হয়ে আসছে। এই সংস্কার আমরা নিশিকান্ত বাবুর মতো অনেকের মধ্যেই দেখতে পাবো। তাই গল্পে দেখা যায় বিড়ি ফ্যাক্টরিতে কাজ করে নটবরের মুখেও শোনা যায়-

" এসব বামুন-কায়েতে দিয়ে বিড়ি বাঁধার কাজ হয় না।"[২]

নিশিকান্তবাবু আক্ষেপে প্রকাশ করেছেন। তিনি নিজেকে দোষী ভাবছেন, পূর্বপুরুষদের কাছে ক্ষমা চাওয়ার প্রসঙ্গও নিশিকান্তবাবুর মধ্যে দেখা গেছে। তাই তিনি বলেন-

"কিন্তু ওপরে যিনি আছেন তিনি সাক্ষী, নিজের ইচ্ছায় নিশিকান্ত এ কাজ নেয়ে নি।"[৩]

নিশিকান্ত নিজের সাথে ক্রমাগত লড়াই করে চলছেন, তিনি বাধ্য হয়ে বিড়ি বাঁধার কাজ করছেন একটু মাথা গোজানোর ঠাঁই পাওয়ার জন্য। তারপর দেখা যায় উপরি রোজগার করার জন্য নিশিকান্তকে অপমান হতে হয়। তা নটবরের উক্তিতে ধরা পড়ে-

"দেশে থেকে ভেসে এয়েছিলি, দয়া করে কাজ দিলুম, তা দু'দিন যেতে না যেতেই ফাঁকি। যত স্লা উড়ো লোক এসে জুটেছে, চেপে বসছে আমাদের ঘাড়ে। এদের দিয়ে দেশের চিবিদ্ধি।"[৪]

নটবরের উপরউিক্ত কথাতে নিশিকান্তকে বিদ্ধ করেছে। নির্বিচারে অপমান সহ্য করে যাচ্ছে উদ্বাস্তু নিশিকান্ত। নিজেকে মাঝে মধ্যে শান্তনা দেনে, পরিবেশের সাথে অভিযোজিত হয়ে টিকে থাকা বা বেঁচে থাকাই তো জীবন। এই পরিবেশের সাথে নিজেকে মানিয়ে নিয়ে টিকিয়ে রাখতে না পারলে কালের নিয়মে মুছে যেতে হয়। তাই নিশিকান্তবাবু নিজেকে মানিয়ে নিয়েছে মধু, গনেশ, সনাতন , ভৈরব ও অর্জুনদের দলে। তাদের সাথে মিলে যাওয়া মিলিয়ে নেওয়া জোর করে হয়না, প্রাণসত্তার মানবত্তার তাগিদের মধ্যে হয়। এটাই তো প্রাণের ধর্ম মানুষের জীবনের কাছে এই বৈষম্য, সংস্কারকে হার মানতে হয়। চতুবর্ণের নিয়মে নিশিকান্ত বিষম শ্রেণীর হলেও দারিদ্রের নিয়মে সবাই একই পঙতির । আর্থিক অবস্থার জন্য সবাই সমধর্মী ভেবে পরস্পরের সঙ্গে মিলেমিশে যাওয়া যেন আরও স্বাভাবিক হয়ে ওঠে। বেঁচে থাকার জন্য প্রয়োজন রসদ। আর এই রসদ মেটানোর জন্য জীবিকা, আর এই জীবিকা কেন্দ্রীক সম্পর্ক হয়ে ওঠে আত্মিক। তাই সহকর্মীদের সঙ্গে এই আত্মিক সম্পর্ক হয়ে ওঠে সুসম্পর্ক। মধু, সনাতন অর্জুনের থেকে নিশিকান্ত বয়সে অনেকটাই বড়। তাই তাদের কাছে অবলীলাক্রমে হয়ে উঠেছে দাদু। তাদের মধ্যে এই ভালোবাসার মেলবন্ধন মনের সমস্ত অন্ধকার মুছে দিয়েছে। পরে দেখা যায় নিশিকান্তবাবুর মনের মধ্যে যে অস্বস্তিবোধ কাজ করত তা তাদের এই মেলে বন্ধনের জন্য অনেকটা স্বস্তি পেয়েছে। একদিন অসুস্থ ভৈরবকে ফ্যাক্টরি থেকে তার বস্তিতে পৌঁছে দিয়ে নিশিকান্ত অনুভব করে বস্তি ও ক্যাম্পের রূপ মূলত একই। এই মানুষের পথ চলার যে যুদ্ধ তা যেন একই রীতিতে গড়া। বর্ণবৈষম্যের কারণে তাদের বিভাজন আলাদা হলেও তাদের সামাজিক অবস্থান সমান। তাই দেখা যায় প্রাণের টানে সমগোত্রীয়তায়, মানবিকতায় সুশীতল বিড়ি ফ্যাক্টরির সকল সহকর্মীরা আত্মীয়তার বন্ধনে বেঁধে আনন্দ উল্লাসে মেতে ওঠে। নিশিকান্ত মনের সব দ্বন্দ্ব কাটিয়ে আনন্দে মাতোয়ারা হয়ে ওঠে। নিম্নে দেওয়া উক্তির মধ্যে তা ধরা পড়ে-

"মনরে মধ্যে যে উঁচু-নিচুবোধটুকু তখনও ছিল, বারকয়েক কেঁপে কেঁপে যেন সমতল হয়ে গেল। অদৃষ্ট নিশিকান্ত চক্রবর্তীর খোরাক এই অন্ত্যজ মানুষগুলোর সঙ্গে একই শানকিতে বেড়েছে। আলাদা পংক্তিতে আসনরে বিড়ম্বনা আর নেই।"[৫]

সুশীতল বিড়ি ফ্যাক্টরিতে কাজ করার ফাঁকে ফাঁকে সে একটি পানের দোকান দেয়। কাজের ফাঁকে অবসর সময়ে সে পান দোকানে বসে পান বিক্রি করে। এই পানের দোকানকে কেন্দ্র করে নিশিকান্ত ও অন্যান্যদের মনরে মধ্যে তুমুল আলোড়ন হয়। এতদিন ধরে নিশিকান্তের মনরে মধ্যে বিরাজ করছে এদেশের মাটিতে স্থান পেয়েছে। এ স্থান শুধু জীবিকা জয়ের না; আত্মীয়তার উ□সবের প্রাণের বন্ধনের।

নিশিকান্ত চক্রবর্তীকে জীবনরে অর্থ খুঁজতে জীবিকা সন্ধানের জন্য অনেক ধাপ অতিক্রম করতে হয়েছে। উদ্বাস্তু নিশিকান্তকে এখানে এসে অনেক লাঞ্ছনা, শোষণ, বঞ্চনা পেয়েছে এবং অবশেষে তার স্থান হয়েছে 'সুশীতল বিড়ি ফ্যাক্টরিতে'। জীবনরে নানান বাধা বিপত্তি নিশিকান্তকে ক্ষত বিক্ষত করছেলি। তা আমরা জানতে পারি তার স্মৃতি রোমন্থনের মাধ্যমে।। নতুন নতুন শিক্ষায় শিক্ষিত করে তোলে জীবনরে নানা অভিজ্ঞতা। জীবনরে নানান অভিজ্ঞতা অম্ল-মধুর-তিক্ততায় গাঁথা হতে থাকে জীবনকথায়। আমরা নিশিকান্তর জীবনকথায় জানতে পারি অম্ল-মধুর-তিক্ততায় তার জীবনরে বাঁক বদল হয় এবং জীবন সম্পর্কে নতুন বোধ জন্ম নেয়। 'দ্বিজ' নিশিকান্ত নতুন জায়গায় এসে প্রথমে পারিবারিক ঐতিহ্য মেনে জীবিকার খোঁজ করছলি। তিনি কাজরে সন্ধানরে জন্য গঙ্গাঘাট থেকে ধনীব্যক্তিদের চণ্ডীমণ্ডপ পর্যন্ত ঘুরছেনে, কিন্তু তিনি কোথাও কাজ পাননি। উপরন্ত কাজরে সন্ধান করতে গিয়ে জুটছে অপমান আর লাঞ্ছনা। পূর্ববঙ্গ থেকে আসা নিশিকান্তের যখন চণ্ডীপাঠ করছিল তখন শ্রোতাদের মধ্যে তা হাস্যরোল সৃষ্টি করে। বংশপরম্পরায় সে যে পুরোহিতি যজমানী করে আসছিল তা এদেশীয় মানুষদের কাছে গ্রহনীয় হয়ে ওঠেনি। বরং সে হাসির পাত্র হয়ে ওঠে-

"চণ্ডীপাঠ তো তোমাকে দিয়ে হবে না চাঁদ, তুমি বরং জুতো শেলাই করতে শেখো। কাজরে কাজ হবে, দু'পয়সা ঘরে আসবে।"[৬]

নিশিকান্তের এই চরম অপমানিত হওয়া নতুন করে বাঁচার পথ দেখায়। 'ব্রাক্ষণ্য অভিমান ময়ূরপুচ্ছ' ছেড়ে নতুন জীবিকার সন্ধানে এগিয়ে যায়। দেশভাগের ফলে হঠা□ করে জনবৃদ্ধি, অর্থসংকট মূল্যবোধরে অভাব মানুষকে এক খাদে নিয়ে এসে ফেলে দিয়েছিল। মানুষ বেঁচে থাকার জন্য যোদ্ধায় পরিণত হয়েছিল। নিশিকান্ত নিজেরে ভুয়ো অভিমানকে দূরে সরিয়ে দিয়েছিল জীবিকার লড়াইয়ের এক কঠিন পরীক্ষায়। তারপর তার মধ্যে দেখা যায় পারস্পরিক মমত্ববোধ, হৃদ্যতা, সহকর্মীদের আন্তরিকতা তার জীবনবোধকে মধুরময় করে তোলে। বেঁচে থাকার জন্য তার যে লড়াই, তার জীবনে অনেক বোধরে জন্ম দেয়। যেখানে তার যে ভুয়ো কৃত্রিম সংস্কার ছিল তা মুহূর্তের মধ্যে শেষ হয়ে যায়। তার মধ্যে শুধু বেঁচে থাকার জন্য যে মৌলিক চাহিদা ও মানবতাবোধ থাকে তা থেকে যায়। আর থেকে যায় হৃদ্যতা ও মমত্ববোধ। ব্রাক্ষণ্য সংস্কারবাহী নিশিকান্ত জীবনবোধে উত্তীর্ণ হয়ে নানান উ□সবে সামিল হয়েছে। জীবনরে মূলস্রোতে তার মনপ্রাণ বইতে থাকে।

গল্পের শেষদিকে আমরা দেখি নিশিকান্ত পানের ব্যবসাকে কেন্দ্র করে আনন্দিত। কিন্তু মানুষের মনরে মধ্যে একবার যে সংস্কারের বীজ রোপিত হয় তা কিন্তু একেবারে ধুয়ে মুছে যায় না বা যেতে পারে না। তা আমরা লক্ষ্য করে থাকি নিশিকান্তের মনরে মধ্যেও। এই পান সাজার কাজ নিশিকান্তের স্ত্রী'র কাছে ব্রাক্ষণ্য কাজ অনুসারী বলে মনে হয় না। যা নিশিকান্তকে মর্মাহত করছে এবং জীবনরে চলার পথে অমোঘ শিক্ষালাভ করছে এবং উত্তীর্ণ হয়েছে উচ্চতর অনুভবে। কিন্তু সংকীর্ণ মোড়কে আবারও আহত হয়েছে। তাকে মধ্যবিত্ত জীবনবোধ আষ্টেপৃষ্ঠে চেপে ধরছে। লড়াই বাইরের জগ□ থেকে ঘরের দেওয়াল পর্যন্ত পৌঁছেছে। অপমানের শত শত তীর বিদ্ধ হতে হতে গভীরভাবে আহত হয়েছে ঘরের ভিতর। ঘরের ভিতরে তার যে অন্ধকার আছে তা তিনি দূর করতে পারেননি। 'সুশীতল বিড়ি ফ্যাক্টরিতে' সে আত্মীয়তা স্থাপন করছে-

"ঠিক পছন্দ হচ্ছে না, তা নয়, কিন্তু শিরশেরিে অস্বস্তিটুকু যায় না। শীতের দিনে যেন নাইবে বলে পুকুরঘাটে এসেছে। নিশিকান্ত পা বাড়ায় একবার, ঝাঁপ দেয়ে আর কি, গায়ে কাঁটা দেয়ে, আবার পিছিয়ে যায়।"[৭]

সহকর্মীদের সাথে মেলিমেশি থাকার জন্য তিনি যে অস্বস্তিবোধ করতেন তা আত্মীয়তার বন্ধনে রূপান্তরিত হয়ে যায়। নিশিকান্ত যে বিপরীতমুখী স্রোতধারায় নিজেকে সঁপে দিয়েছিল তা টিকিয়ে রাখার জন্য তা

ধীরে ধীরে স্রোতের অনুগামী হয়েছে। শুধু যে তিনি তার সহকর্মীদের সাথে এই আত্মীয়তাবোধ বা মমত্ববোধ রেখেছেন তা কিন্তু নয়, পথে , বাসে, ট্রেনে চলার সময় সাধারণ মানুষের সাথে সে নিজের সাদৃশ্য অনুভব করেছেন-

"শুধু অর্জুন সনাতনই নয়। আর অনেককে নিয়ে যেন ছড়িয়ে আছে এই পরিবার; দু'বেলা লোকাল ট্রেনের থার্ডক্লাসে যারা যাওয়া আসা করে, যারা ভিড়ে ছাদে ওঠে, কিংবা ফুটবোর্ডে ঝোলে, সকলের মধ্যেই নিশিকান্ত যেন একান্ত আত্মীয়ের মুখ দেখতে পেল।"[৮]

এরপর নিশিকান্তকে প্রাণভরে শ্বাস নিতে দেখা যায়। ছিন্নমূল হয়ে এদেশে আসার অবধি নিজের অস্তিত্বের অন্বেষের যে লড়াই তার চলছিল আজ যেন তার জয়পতাকা কিছুটা হলেও খোলা জায়গায় উড়ছে। পূর্ববঙ্গ ছেড়ে আসা নিশিকান্তের আপন আস্তিত্ব তার নিজের কাছেই অনেক দূর বলে মনে হয়েছে-

"কত পিছনে পড়ে আছে সেই নিশিকান্ত চক্রবর্তী,...পূর্বজন্মের মতো সুদূর মনে হয়।... নিশিকান্তের জন্য অনুরাগ আছে সহমর্মী সহকর্মীদের চোখে, এই নিশিকান্তের কাজের তারিফ আছে দশজনের মুখে।"[৯]

তার মনের মধ্যে যখন সকল অন্ধকার দূর হয়ে আলোর ঝলকানি দেখতে পেয়েছে ঠিক তখনই সমস্ত অন্তঃকরণ ছেয়ে নেমে আসে অন্ধকার। ক্যাম্পের ঘরের স্যাঁতস্যাঁতে ভাব রেখে যায় নিশিকান্তের স্ত্রী'র বাক্যে। ঘরের যে সংকীর্ণতা তা মনের সংকীর্ণতায় পর্যবসিত হয়ে অন্তরের সীমায় প্রবেশ করে। মধ্যবিত্ত উদ্বাস্তু নিশিকান্তের গলা চেপে ধরে উদারচেতা। মুহূর্তের মধ্যে যে অন্ধকার নেমে এসেছে তা তিনি লক্ষ্য করেন। বাইরের মানুষের কাছে তিনি যে ভালোবাসা, হৃদ্যতা পেয়েছিলেন তা মুহূর্তের মধ্যে তিক্ততায় পরিণত হয়ে যায় তার স্ত্রী'র কথায়। তার চোখের জল অন্তঃকরণের প্রকাশ ঘটে-

"আমারে পান-আলা কইয়া যত না অপমান করছে মন্মথ, পান সাজনের নিচা কাম কইয়া তার থিকা কম অপমান করলা না তুমি।" [১০]

লেখক দেখিয়েছেন দেশভাগোত্তর সময়ে মধ্যবিত্ত সমাজ এক দ্বৈত মানসিকতায় ভুগছে আর একদিকে তারা ভদ্রতা, সংস্কৃতি ও নীতির মুখোশ ধরে রাখতে চায়, অন্যদিকে তাদের ভিতরে জমে থাকা ভয়, নিরাপত্তাহীনতা ও স্বার্থপরতা তাদের মানুষ হিসেবে ক্ষয় করে ফেলেছে। দেশভাগ মানুষের জীবনে করুণ পরিণতি নিয়ে এনেছিল তা আর বলার অপেক্ষা রাখে না। দেশভাগের মতো ঐতিহাসিক বিপর্যয়ের সময়েও, যদি মানুষ মানবতা ভুলে যায়, তবে তার শিক্ষিত মধ্যবিত্ত পরিচয় কোন অর্থে বহন করে না। দেশভাগের অস্তিত্ব সংকট মানুষের জীবনকে কিভাবে বিভাজিত করেছিল তার চিত্র খুঁজে পাই আমরা সন্তোষকুমার ঘোষের 'দ্বিজ' গল্পের মধ্যে। গল্পে আমরা দেখি দেশভাগ মানুষকে আর্থিক সংকট, খাদ্য সংকট, আশ্রয় সংকট এসবের পাশাপাশি মানুষ জীবিকার সন্ধানে ইতস্তত সংকটাকীর্ণ হয়েছে। দেশভাগের পরে তারা যে দেশে আশ্রয় নিয়েছে সেখানে কেউ এক টুকরো জমি ছাড়তে নারাজ মাথা গোজার জন্য তার বদলে তারা পেয়েছে অপমান লাঞ্ছনা। গল্পকার খুব কাছে থেকে দেখেছিলেন বিভিন্ন মানুষের মোড়কহীন চিত্র। তিনি পেশায় ছিলেন একজন সাংবাদিক। তিনি তার লেখনীর মধ্যে ফুটিয়ে তুলেছেন জীবন সংকটের কাহিনী। 'দ্বিজ' গল্পে আমরা দেখতে পাই রূপকথা নয়, জীবনে বন্ধুর পথ ধরে চলার প্রয়াস, দেখতে পাই লড়াই অন্তরে, অন্দরে ও বাইরে। দেশভাগ মধ্যবিত্ত মানুষদের সংকটকে আরও ভয়ংকর করে তোলে। দেশভাগের অনবদ্য ফলস্বরূপ উদ্বাস্তু মানুষের জীবনকে নদীর কিনারে পৌঁছে দিয়েছে। তারা নতুন নতুন সমস্যায় পর্যবসিত হয়েছে। সন্তোষকুমার ঘোষ 'দ্বিজ' গল্পে দেশভাগোত্তর বাঙালি মধ্যবিত্ত সমাজের আত্মবিভক্তি ও মানবিকতার সংকটকে সূক্ষ্ম ব্যঙ্গ ও প্রতীকী ভাষায় তুলে ধরেছেন। তিনি বোঝাতে চেয়েছেন প্রকৃত 'দ্বিজ' সেই, যে মানুষ হিসেবে দ্বিতীয়বার জন্ম নেয়- মানবতার চেতনায়; গল্পকার এই গল্পে সেই কথায় ব্যক্ত করেছেন।

তথ্যসূত্র:

১. **ঘোষ, সন্তোষকুমার।** *গল্পসমগ্র।* কলকাতা: দ’জ পাবলিশিং, জানুয়ারি ২০০৭, পৃ. ২৮৪-২৮৫।

২. তদবে, পৃ. ২৮৪।

৩. তদবে, পৃ. ২৮৪।

৪. তদবে, পৃ. ২৮৪।

৫. তদবে, পৃ. ২৮৮।

৬. তদবে, পৃ. ২৮৫।

৭. তদবে, পৃ. ২৮৪।

৮. তদবে, পৃ. ২৮৯।

৯. তদবে, পৃ. ২৮৯।

১০. তদবে, পৃ. ২৯০।